ছোটদের সেরা

বিজ্ঞান রচনা সংকলন

জগদীশচন্দ্র বসু

ছোটদের সেরা বিজ্ঞান রচনা সংকলন
জগদীশচন্দ্র বসু

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৭৫ টাকা

CHOTODER SERA BIGGAN RACHANA SANGKALAN A Collection of Juvenile Science by JAGADISH CHANDRA BOSE Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: February 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94411-1-3

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

ভূমিকা

শুধুমাত্র সাহিত্যচর্চা করতেন, আমাদের এই বাংলাদেশে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। বাংলা সাহিত্যের প্রথম কল্পবিজ্ঞান তাঁর রচনা। রচনাটির নাম 'পলাতক তুফান'।

বিজ্ঞানসাহিত্যের কথা বললে আমাদের বলতে হয়, গবেষণার নানা ফলাফল তিনি সহজবোধ্য ভঙ্গিতে সাহিত্যের লালিত্য যোগ করে পাঠকের দরবারে পরিবেশন করেছেন। এই বইয়ে আমরা তাঁর লেখা এগারোটি রচনা সংকলিত করেছি। আটটি রচনাই তাঁর গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত। শেষের তিনটি লেখা প্রাণিদের আচার আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের ফসল। এমন সহজ ও সরল করে বিজ্ঞানের লেখাও তাহলে লেখা যায়!

সমগুণান্বিত লেখা আমরা গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে পরে অনেক পেয়েছি। আগেও জগদানন্দ রায় (১৮৬৯-১৯৩৩), উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৬৩-১৯১৫) ও সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩) বেশ কিছু এজাতীয় লেখা লিখেছেন। জগদানন্দের 'কাক', 'উপেন্দ্রকিশোরের 'মাছরাঙ্গার স্কুল', সুকুমার রায়ের 'আলিপুরের বাগানে' সমজাতীয় রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বিজ্ঞান গবেষণায় যেমন জগদীশচন্দ্র আধুনিক ভারতের প্রথম চরিত্র, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যেও তিনি প্রথম কৃতিত্বের নজির রেখেছেন। ১৩২৮ বাংলায় প্রকাশিত 'অব্যক্ত' এক অসামান্য বিজ্ঞানসাহিত্য রচনার সংকলন। লেখাগুলি 'সাহিত্য', 'দাসী', 'মুকুল', 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় বেরিয়েছে। কয়েকটি লেখা তাঁর বক্তৃতার সংকলন। 'গাছের কথা' নামের দুটি লেখা ও 'মন্ত্রের সাধন' রচনাটি 'মুকুল' ও প্রকাশিত হয়েছিল। 'অদৃশ্য আলোক' তাঁর পদার্থবিদ্যা গবেষণার ফসল। এই রচনা 'মোসলেম ভারত' এ বেরিয়েছিল। রচনাটি আয়তনে বড়। বেশ গোটা কয় উপশিরোনাম রয়েছে। যেমন, আলোর সাধারণ প্রকৃতি, আলোর বিবিধ বর্ণ, মৃত্তিকা-বর্তুল ও কাঁচ-বর্তুল, সর্বমুখী এবং একমুখী আলো, বক-কচ্ছপ সংবাদ, তারহীন সংবাদ। উপশিরোনামের বেলায়

কোনো লেখাতেই আমরা সাধুভাষার শব্দকে চলিত ভাষায় পরিবর্তন করিনি।

'নির্বাক জীবন' নিঃসন্দেহে একটি উঁচু মানের প্রবন্ধ। উদ্ভিদজগতের কথা নিজের গবেষণার অভিজ্ঞতায় আলোকিত করেছেন। এই লেখাটিও আয়তনে বড়। অনেকগুলি উপশিরোনাম রয়েছে। স্পন্দনশীল উদ্ভিদপেশির নানা প্রসঙ্গ এই লেখায় তিনি খুব সুন্দর তুলে এনেছেন। লেখাটিতে বিজ্ঞানীর দর্শনচিন্তারও খানিকটা প্রতিফলন রয়েছে। 'আহত উদ্ভিদ' রচনাটি ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতার লিখিত রূপ। এটিও উদ্ভিদবিদ্যার গবেষণা কাহিনি। তবে খুবই সহজ সরল ও সরস-ভঙ্গীতে লেখা। তারও বেশ ক'টি উপশিরোনাম রয়েছে।

'স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা প্রবাহ' ছোটদের বার কয় পড়তে হবে। বাইরের ও ভেতরের শক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন জগদীশচন্দ্র। শক্তির কথা শেষে ইন্দ্রিয়ের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর লেখায় উদ্ভিদের স্নায়ুসূত্র রয়েছে বলতে চেয়েছেন। 'বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী' 'প্রবাসী'র রচনা। সূর্যমুখী ও লজ্জাবতীর কথা লিখেছেন। আলোর সঙ্গে কেমন এদের লুকোচুরি খেলা চলে।

বিজ্ঞানসাহিত্যে রসিকতাবোধ যে অচ্ছুৎ নয় লেখক তাঁর প্রমাণ রেখেছেন।

নতুন প্রজন্ম বিজ্ঞান সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচিত হোক, এই প্রত্যাশা থেকে সাধুভাষাকে চলিতভাষায় বদল করা হয়েছে।

সূচিপত্র

গাছের কথা-১	০৭
গাছের কথা-২	১১
মন্ত্রের সাধন	১৫
অদৃশ্য আলোক	২০
নির্বাক জীবন	২৯
আহত উদ্ভিদ	৩৭
স্নায়ুসূত্রে উত্তেজনা-প্রবাহ	৪৭
বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী	৫৪
বন্দীর মুক্তি	৫৯
ইতর প্রাণীদের কথা	৬৬
সুরেশদের বাগান	৬৮
রচনা পরিচিতি	৭২

গাছের কথা-এক

গাছেরা কি কিছু বলে? অনেকে বলিবেন, এ আবার কেমন প্রশ্ন? গাছ কি কোনো দিন কথা কহিয়া থাকে? মানুষেই কি সব কথা ফুটিয়া বলে? আর যাহা ফুটিয়া বলে না, তাহা কি কথা নয়? আমাদের একটি খোকা আছে, সে সব কথা ফুটিয়া বলিতে পারে না; আবার ফুটিয়া যে দুই চারিটি কথা বলে, তাহাও এমন আধো আধো ও ভাঙা ভাঙা যে, অপরের সাধ্য নাই তাহার অর্থ বুঝিতে পারে। কিন্তু আমরা আমাদের খোকার সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারি। কেবল তাহা নয়। আমাদের খোকা অনেক কথা ফুটিয়া বলে না; চক্ষু, মুখ ও হাত নাড়া, মাথা নাড়া প্রভৃতির দ্বারা আকার ইঙ্গিতে অনেক কথা কয়, আমরা তাহাও বুঝিতে পারি, অন্যে বুঝিতে পারে না। একদিন পার্শ্বের বাড়ি হইতে একটি পায়রা উড়িয়া আসিয়া আমাদের বাড়িতে বসিল; বসিয়া গলা ফুলাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। পায়রার সঙ্গে খোকার নূতন পরিচয়; খোকা তাহার অনুকরণে ডাকিতে আরম্ভ করিল। পায়রায় কি-রকম ভাবে ডাকে? বলিলেই ডাকিয়া দেখায়; তদ্‌ভিন্ন সুখে দুঃখে, চলিতে বসিতে, আপনার মনেও ডাকে। নূতন বিদ্যাটা শিখিয়া তাহার আনন্দের সীমা নেই।

একদিন বাড়ি আসিয়া দেখি, খোকার বড় জ্বর হইয়াছে; মাথার বেদনায় চক্ষু মুদিয়া বিছানায় পড়িয়া আছে। যে দুরন্ত শিশু সমস্ত দিন বাড়ি অস্থির করিয়া তুলিত, সে আজ একবার চক্ষু খুলিয়াও চাহিতেছে না। আমি তাহার বিছানার পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলাম। আমার হাতের স্পর্শে খোকা আমাকে চিনিল, এবং অতি কষ্টে চক্ষু খুলিয়া আমার দিকে খানিক ক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর পায়রার ডাক ডাকিল। ঐ ডাকের ভিতর আমি অনেক কথা শুনিলাম। আমি বুঝিতে পারিলাম, খোকা বলিতেছে, 'খোকাকে দেখিতে আসিয়াছ? খোকা তোমাকে বড় ভালবাসে।' আরও অনেক কথা বুঝিলাম, যাহা আমিও কোনো কথার দ্বারা বুঝাইতে পারি না।

যদি বল, পায়রার ডাকের ভিতর এত কথা কি করিয়া শুনিলে? তাহার উত্তর এই, খোকাকে ভালবাসি বলিয়া। তোমরা দেখিয়াছ, ছেলের মুখ দেখিয়া মা বুঝিতে পারেন, ছেলে কি চায়। অনেক সময় কথারও আবশ্যক হয় না। ভালবাসিয়া দেখিলেই অনেক গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

আগে যখন একা মাঠে কিংবা পাহাড়ে বেড়াইতে যাইতাম, তখন সব খালি-খালি লাগিত। তার পর গাছ, পাখি, কীট-পতঙ্গদিগকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি। সে অবধি তাদের অনেক কথা বুঝিতে পারি, আগে যাহা পারিতাম না। এই যে গাছগুলি কোনো কথা বলে না, ইহাদের যে আবার একটা জীবন আছে, আমাদের মতো আহার করে, দিন দিন বাড়ে আগে এ সবকিছুই জানিতাম না। এখন বুঝিতে পারিতেছি। এখন ইহাদের মধ্যেও আমাদের মতো অভাব, দুঃখ-কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদ্‌গুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুতা হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ্চ গুণ স্বার্থত্যাগ—গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। সন্তানের জন্য নিজের জীবন-দান উদ্ভিদেও সচরাচর দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র। ক্রমে এ সব কথা তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা শুষ্ক গাছের ডাল সকলেই দেখিয়াছ। মনে কর, কোনো গাছের তলাতে বসিয়াছ। ঘন সবুজ পাতায় গাছটি ঢাকা, ছায়াতে তুমি বসিয়াছ। গাছের নীচে এক পার্শ্বে একখানি শুষ্ক ডাল পড়িয়া আছে। এক সময় এই ডালে কত পাতা ঠিল, এখন সব শুকাইয়া গিয়াছে, আর ডালের গোড়ায় উই ধরিয়াছে। আর কিছুকাল পরে ইহার চিহ্নও থাকিবে না। আচ্ছা, বল তো—এই গাছ আর এই

মরা ডালে কি প্রভেদ? গাছটি বাড়িতেছে; আর মরা ডালটা ক্ষয় হইয়া যাইতেছে; একে জীবন আছে, আর অন্যটিতে জীবন নাই। যাহা জীবিত, তাহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে। জীবিতের আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার গতি আছে, অর্থাৎ তাহারা নড়ে চড়ে। গাছের গতি হঠাৎ দেখা যায় না। লতা কেমন করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাছকে জড়াইয়া ধরে, দেখিয়াছ?

জীবিত বস্তুতে গতি দেখা যায়; জীবিত বস্তু বাড়িয়া থাকে। কেবল ডিমে জীবনের কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। ডিমে জীবন ঘুমাইয়া থাকে। উত্তাপ পাইলে ডিম হইতে পাখির ছানা জন্মলাভ করে। বীজগুলি যেন গাছের ডিম; বীজের মধ্যেও এরূপ গাছের শিশু ঘুমাইয়া থাকে। মাটি, উত্তাপ ও জল পাইলে বীজ হইতে বৃক্ষ শিশুর জন্ম হয়।

বীজের উপর এক কঠিন ঢাক্না; তাহার মধ্যে বৃক্ষ-শিশু নিরাপদে নিদ্রা যায়। বীজের আকার নানাপ্রকার, কোনোটি অতি ছোট, কোনোটি বড়। বীজ দেখিয়া গাছ কত বড় হইবে বলা যায় না। অতি প্রকাণ্ড বটগাছ, সরিষা অপেক্ষা ছোট বীজ হইতে জন্মে। কে মনে করিতে পারে, এত বড় গাছটা এই ক্ষুদ্র সরিষার মধ্যে লুকাইয়া আছে? তোমরা হয়তো কৃষকদিগকে ধানের বীজ ক্ষেত্রে ছড়াইতে দেখিয়াছ। কিন্তু যত গাছ-পালা, বন-জঙ্গল দেখ, তাহার অনেকের বীজ মানুষ ছড়ায় নাই। নানা উপায়ে গাছের বীজ ছড়াইয়া যায়। পাখিরা ফল খাইয়া দূর দেশে বীজ লইয়া যায়। এই প্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপে গাছ জন্মিয়া থাকে। ইহা ছাড়া অনেক বীজ বাতাসে উড়িয়া অনেক দূর দেশে ছড়াইয়া পড়ে। শিমুল গাছ অনেকে দেখিয়াছ। শিমুল-ফল যখন রৌদ্রে ফাটিয়া যায় তখন তাহার মধ্য হইতে বীজ তুলার সঙ্গে উড়িতে থাকে। ছেলেবেলায় আমরা এই সকল বীজ ধরিবার জন্য ছুটিতাম; হাত বাড়াইয়া ধরিতে গেলেই বাতাস তুলার সহিত বীজকে অনেক উপরে লইয়া যাইত। এই প্রকারে দিন-রাত্রি দেশ-দেশান্তরে বীজ ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক বীজ হইতে গাছ জন্মে কিনা, কেহ বলিতে পারে না। হয়তো কঠিন পাথরের উপর বীজ পড়িল, সেখানে আর অঙ্কুর বাহির হইতে পারিল না। অঙ্কুর বাহির হইবার জন্য উত্তাপ, জল ও মাটি চাই।

যেখানেই বীজ পড়ুক না কেন, বৃক্ষ-শিশু অনেক দিন পর্যন্ত বীজের মধ্যে নিরাপদে ঘুমাইয়া থাকে। বাড়িবার উপযুক্ত স্থানে যতদিন না পড়ে, ততদিন বাহিরের কঠিন ঢাক্না গাছের শিশুটিকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করে।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বীজ পাকিয়া থাকে। আম, লিচুর বীজ বৈশাখ মাসে পাকে; ধান, যব ইত্যাদি আশ্বিন কার্তিক মাসে পাকিয়া থাকে। মনে কর, একটি গাছের বীজ আশ্বিন মাসে পাকিয়াছে। আশ্বিন মাসের শেষে বড় ঝড় হয়। ঝড়ে পাতা ও ছোট ছোট ডাল ছিঁড়িয়া চারিদিকে পড়িতে থাকে। এইরূপে বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। প্রবল বাতাসের বেগে কোথায় উড়িয়া যায়, কে বলিতে পারে? মনে কর, একটি বীজ সমস্ত দিন-রাত্রি মাটিতে লুটাইতে লুটাইতে

একখানা ভাঙা ইট কিংবা মাটির ডেলার নীচে আশ্রয় লইল। কোথায় ছিল, কোথায় আসিয়া পড়িল। ক্রমে ধুলা ও মাটিতে বীজটি ঢাকা পড়িল। এখন বীজটি মানুষের চক্ষুর আড়াল হইল। আমাদের দৃষ্টি হইতে দূরে গেল বটে, কিন্তু বিধাতার দৃষ্টির বাহিরে যায় নাই। পৃথিবী মাতার ন্যায় তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বৃক্ষ-শিশুটি মাটিতে ঢাকা পড়িয়া বাহিরের শীত ও ঝড় হইতে রক্ষা পাইল। এইরূপে নিরাপদে বৃক্ষ-শিশুটি ঘুমাইয়া রহিল।

[এই প্রবন্ধ এবং পরের দুইটি শিশুদিগের জন্য লিখিত]
১৮৯৪

গাছের কথা-২

মাটির নীচে অনেক দিন বীজ লুকিয়ে থাকে। মাসের পর মাস এইভাবে কেটে গেল। শীতের পর বসন্ত এলো। তার পর বর্ষার শুরুতে দুই-এক দিন বৃষ্টি হলো। এখন আর লুকিয়ে থাকবার দরকার নেই। বাইরে থেকে কে যেন শিশুকে ডেকে বলছে, 'আর ঘুমিও না, উপরে উঠে এসো, সূর্যের আলো দেখবে।' আস্তে আস্তে বীজের ঢাকনাটি খসে পড়ল, দুটি কোমল পাতার মধ্য থেকে অঙ্কুর বের হলো। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়ে দৃঢ়ভাবে মাটি ধরে থাকল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করে উপরে উঠল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠতে দেখেছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলে অবাক হয়ে নতুন দেশ দেখছে।

গাছের অঙ্কুর বের হলে যে অংশটি মাটির ভেতর প্রবেশ করে, তার নাম মূল। আর যে অংশ উপরের দিকে বাড়তে থাকে, তাকে বলে কাণ্ড। সকল গাছেই 'মূল' আর 'কাণ্ড' এই দুই ভাগ দেখবে। এই এক আশ্চর্যের কথা, গাছকে যেভাবেই রাখ, মূল নীচের দিকে ও কাণ্ড উপরের দিকে যাবে। একটি টবে গাছ ছিল। পরীক্ষা করবার জন্য কয়েক দিন ধরে টবটিকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলাম। গাছের মাথা নীচের দিকে ঝুলে রইল, আর শেকড় উপরের দিকে রইল। দুই-এক দিন পরে দেখতে পেলাম যে, গাছ যেন টের পেয়েছে। তার সব ডালগুলো বাঁকা হয়ে উপরের দিকে উঠল ও মূলটি ঘুরে নীচের দিকে নেমে গেল। তোমরা অনেকে শীতকালে অনেকবার মূলো কেটে শয়তা করে থাকবে। দেখেছ, প্রথমে শয়তার পাতাগুলো ও ফুল নীচের দিকে থাকে। কিছুদিন পরে দেখা যায়, পাতা ও ফুলগুলো উপর দিকে উঠেছে।

আমরা যেমন খাই, গাছ তেমনই খায়। আমাদের দাঁত আছে, আমরা কঠিন জিনিস খেতে পারি। ছোট ছোট শিশুদের দাঁত নেই; তারা কেবল দুধ খায়। গাছের দাঁত নেই, সুতরাং তারা কেবল জলীয় দ্রব্য কিংবা বাতাস থেকে খাবার গ্রহণ করতে পারে। মূল দিয়ে মাটি থেকে গাছ রস শোষণ করে। চিনিতে জল ঢাললে চিনি গলে যায়। মাটিতে জল ঢাললে মাটির ভেতরের অনেক জিনিস গলে যায়। গাছ সেই সব জিনিস খায়। গাছের গোড়ায় জল না দিলে গাছের খাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ও গাছ মরে যায়।

অণুবীক্ষণ দিয়ে অতি ক্ষুদ্র পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। গাছের ডাল কিংবা মূল এই যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, গাছের মধ্যে হাজার হাজার নল আছে। এইসব নল দিয়ে মাটি হতে গাছের শরীরে রস প্রবেশ করে।

এছাড়া গাছের পাতা বাতাস থেকে খাবার সংগ্রহ করে। পাতার মধ্যে অনেকগুলো ছোট মুখ আছে। অণুবীক্ষণ দিয়ে এই সব মুখে ছোট ছোট ঠোঁট দেখা যায়। যখন আহার করবার দরকার হয় না তখন ঠোঁট দুটি বুজে যায়। আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বের হয়ে যায়; তাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। তা যদি পৃথিবীতে জমতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করে মরে যেতে পারে। বিধাতার করুণার কথা ভেবে দেখ। যা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাই খেয়ে বাতাস পরিষ্কার করে দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলো পড়ে, তখন

পাতাগুলো সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হতে অঙ্গার বের করে নেয়। এই অঙ্গার গাছের শরীরে প্রবেশ করে গাছকে বাড়াতে থাকে। গাছেরা আলো চায়, আলো না হলে এরা বাঁচতে পারে না। গাছের সর্বপ্রধান চেষ্টা, কি করে একটু আলো পাবে। যদি জানালার কাছে টবে গাছ রাখ, তবে দেখবে, সমস্ত ডালগুলো অন্ধকার দিক ছেড়ে আলোর দিকে যাচ্ছে। বনে গিয়ে দেখবে, গাছগুলো তাড়াতাড়ি মাথা তুলে কে আগে আলো পেতে পারে, তার চেষ্টা করছে। লতাগুলো ছায়াতে পড়ে থাকলে আলোর অভাবে মরে যাবে, এজন্য তারা গাছ জড়িয়ে ধরে উপরের দিকে উঠতে থাকে।

এখন বুঝতে পারছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্যের আলো শরীরে ধারণ করেই গাছ বাড়তে থাকে। গাছের শরীরে সূর্যের কিরণ আবদ্ধ হয়ে আছে। কাঠে আগুন ধরালে যে আলো ও তাপ বের হয়, তা সূর্যেরই তেজ। গাছ ও তার শস্য আলো ধরবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খেয়ে প্রাণ ধারণ করে; গাছে যে সূর্যের তেজ আছে তা এইভাবে আবার জন্তুর শরীরে ঢুকে। শস্য আহার না করলে আমরাও বাঁচতে পারতাম না। ভেবে দেখতে গেলে, আমরা আলো আহার করে বেঁচে আছি।

কোনো কোনো গাছ এক বছর পরেই মরে যায়। সব গাছই মরবার আগে সন্তান রেখে যেতে ব্যগ্র হয়। বীজগুলোই গাছের সন্তান। বীজ রক্ষা করবার জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়ে গাছ একটি ছোট ঘর তৈরি করে। গাছ যখন ফুলে ঢেকে থাকে, তখন কেমন সুন্দর দেখায়। মনে হয়, গাছ যেন হাসছে। ফুলের মতো সুন্দর জিনিস আর কি আছে? গাছ তো মাটি থেকে আহার নেয়, আর বাতাস থেকে অঙ্গার আহরণ করে। এই সামান্য জিনিস দিয়ে কি করে এমন সুন্দর ফুল হল? গল্পে শুনেছি, স্পর্শমণি নামে এক প্রকার মণি আছে, তা ছোঁয়ালে লোহা সোনা হয়ে যায়। আমার মনে হয়, মায়ের স্নেহই সেই মণি। সন্তানের উপর ভালোবাসাটাই যেন ফুলে ফুটে ওঠে। ভালোবাসার স্পর্শেই যেন মাটি এবং অঙ্গার ফুল হয়ে যায়।

গাছে ফুল ফুটে রয়েছে দেখলে আমাদের মনে কত আনন্দ হয়! মনে হয় গাছেরও যেন কত আনন্দ! আনন্দের দিন আমরা দশজনকে নেমন্তন্ন করি। ফুল ফুটলে গাছও তার বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে আনে। গাছ যেন ডেকে বলে, 'কোথায় আমার বন্ধু-বান্ধব, আজ আমার বাড়িতে এসো। যদি পথ ভুলে যাও, বাড়ি যদি চিনতে না পার, সেজন্য নানা রঙে ফুলের নিশান তুলে দিয়েছি। এই রঙিন পাপড়িগুলো দূর থেকে দেখতে পাবে।' মৌমাছি ও প্রজাপতির সঙ্গে গাছের চিরকাল বন্ধুতা। তারা দলে দলে ফুল দেখতে আসে। কোনো কোনো পতঙ্গ দিনের বেলায় পাখির ভয়ে বের হতে পারে না। পাখি তাদেরকে দেখলেই খেয়ে ফেলে। কাজেই রাত না হলে তারা বের হতে পারে না। সন্ধ্যা হলেই তাদের আনবার জন্য ফুল চারদিকে সুগন্ধ ছড়ায়।

গাছ ফুলের ভেতর মধু জমিয়ে রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করে যায়। মৌমাছি আসে বলে গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখে থাকবে। মৌমাছিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে নিয়ে যায়। রেণু ছাড়া বীজ পাকতে পারে না।

এভাবে ফুলের মধ্যে বীজ পেকে থাকে। শরীরের রস দিয়ে গাছ বীজগুলোকে লালনপালন করতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করে সন্তানের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দেয়। যে শরীর কিছু দিন আগে সতেজ ছিল, এখন তা একেবারে শুকিয়ে যেতে থাকে। শরীরের ভার বহন করবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু-হু করে পাতা নাড়িয়ে চলে যেত। পাতাগুলো বাতাসের সঙ্গে খেলা করত, ছোট ডালগুলো তালে তালে নাচত। এখন শুকনো গাছটি বাতাসের ভর সইতে পারে না। বাতাসের এক-একটি ঝাপটা লাগলে গাছটি থর-থর করে কাঁপতে থাকে। এক একটি করে ডালগুলো ভেঙে পড়তে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভেঙে গাছ মাটিতে পড়ে যায়।

এভাবে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়ে গাছ মরে যায়।

মন্ত্রের সাধন

প্রশান্ত মহাসাগরে অনেকগুলি দ্বীপ দেখা যায়। এই দ্বীপগুলি অতি ক্ষুদ্র প্রবালকীটের পঞ্জরে নির্মিত। বহু সহস্র বৎসরে অগণ্য কীট নিজ নিজ দেহ দ্বারা এই দ্বীপগুলি নির্মাণ করিয়াছে।

আজকাল বিজ্ঞান দ্বারা যে সব অসাধ্য সাধন হইতেছে, তাহাও বহু লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টার ফলে। মানুষ পূর্বে একান্ত অসহায় ছিল। বুদ্ধি, চেষ্টা ও সহিষ্ণুতার বলে আজ সে পৃথিবীর রাজা হইয়াছে। কত কষ্ট ও কত চেষ্টার পর মনুষ্য বর্তমান উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মনেও করিতে পারি না। কে প্রথমে আগুন জ্বালাইতে শিখাইল, কে প্রথমে ধাতুর ব্যবহার শিক্ষা দিল, কে লেখার প্রথা আবিষ্কার করিল, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এইমাত্র জানি যে, প্রথমে যাঁহারা কোনো নূতন প্রথা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা পদে পদে অনেক বাধা পাইয়াছিলেন। অনেক সময় তাঁহাদিগকে অনেক নির্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছিল। এত কষ্টের পরেও অনেকে তাঁহাদের চেষ্টা সফল দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আপাততঃ মনে হয়, তাঁহাদের চেষ্টা একেবারে বৃথা গিয়েছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই একেবারে বিফল হয় না। আজ যাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র মনে হয়, দুইদিন পরে তাহা হইতেই মহৎ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রবাল-দ্বীপ যেরূপ একটু একটু করিয়া আয়তনে বর্ধিত হয়, জ্ঞানরাজ্যও সেইরূপ তিল তিল করিয়া বাড়িতেছে। এ সম্বন্ধে দু একটি ঘটনা বলিতেছি।

একশত বৎসর পূর্বে ইটালি দেশে গ্যালভানি নামে একজন অধ্যাপক দেখিতে পাইলেন যে লোহা ও তামার তার দিয়া একটা মরা ব্যাঙকে স্পর্শ করিলে ব্যাঙ নড়িয়া উঠে। তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া এই ঘটনাটির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এরূপ সামান্য বিষয় লইয়া এত সময় অপব্যয় করিতে দেখিয়া, লোকে তাঁহাকে উপহাস করিত। তাঁহার নাম হইল, 'ব্যাঙ-নাচানো' অধ্যাপক। বন্ধুরা আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'মরা ব্যাঙ যেন নড়িল, কিন্তু ইহাতে লাভ কি?'

কি লাভ? সেই যৎসামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া বিদ্যুতের বিবিধ গুণ সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইল। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস কত পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদ্যুৎ দ্বারা পথ-ঘাট আলোকিত হইতেছে, গাড়ি চলিতেছে। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের সংবাদ অন্য প্রান্তে পৌঁছিতেছে। সমস্ত পৃথিবীটি যেন আমাদের ঘরের কোণে

আসিয়াছে—দূর আর দূর নাই। আমাদের স্বর বাড়ির এক দিক হইতে অন্য দিকে পৌঁছিত না। এখন বিদ্যুতের বলে সহস্র ক্রোশ দূরের বন্ধুর সহিত কথাবার্তা বলিতেছি। এমন কি, এই শক্তির সাহায্যে দূর দেশে কি হইতেছে, তাহা পর্যন্ত দেখিতে পাইব। আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের স্বর আর কোনো বাধা মানিবে না।

মনুষ্য এ পর্যন্ত পৃথিবী এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু বহুদিন আকাশ জয় করিতে পারে নাই। ব্যোমযানে শূন্যে উঠা যায় বটে, কিন্তু বাতাসের প্রতিকূলে বেলুন চলিতে পারে না। আর এক অসুবিধা এই যে, বেলুন হইতে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্যাস বাহির হইয়া যায়, এজন্য বেলুন অধিকক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে না।

রেশমের আবরণ হইতে গ্যাস বাহির হইয়া যায় বলিয়া, বেলুন অধিকক্ষণ আকাশে থাকিতে পারে না। সোয়ার্জ নামে একজন জার্মান এই জন্য আলুমিনিয়াম ধাতুর এক বেলুন প্রস্তুত করেন। আলুমিনিয়াম কাগজের ন্যায় হালকা, অথচ ইহা ভেদ করিয়া গ্যাস বাহির হইতে পারে না। বেলুন যে ধাতু নির্মিত হইতে পারে, ইহা কেহ বিশ্বাস করিল না। সোয়ার্জ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বহু বৎসর নিষ্ফল চেষ্টার পর অবশেষে বেলুন নির্মিত হইল। বেলুন যাহাতে ইচ্ছানুক্রমে বাতাসের প্রতিকূলে যাইতে পারে, এজন্য একটি ক্ষুদ্র এঞ্জিন প্রস্তুত করিলেন। জাহাজে যেমন জলের নীচে স্ক্রু থাকে, এঞ্জিনে স্ক্রু ঘুরাইলে জল কাটিয়া জাহাজ চলিতে থাকে, সেইরূপ বাতাস কাটিয়া চলিবার জন্য একটি বড় স্ক্রু নির্মাণ করিলেন। কিন্তু বেলুন নির্মিত হইবার অল্প পরেই সোয়ার্জের অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। যাহার জন্য সমস্ত সম্পত্তি ও জীবন পণ করিয়াছিলেন, তাহার পরীক্ষা করিতে পারিলেন না, এতদিনের চেষ্টা নিষ্ফল হইতে চলিল।

সোয়ার্জের সহধর্মিণী তখন জার্মান গবর্নমেন্টের নিকট বেলুন পরীক্ষা করিবার জন্য আবেদন করিলেন। জার্মান গবর্নমেন্ট যুদ্ধে ব্যোমযান ব্যবহার করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু সোয়ার্জের বেলুন যে কখনও আকাশে উঠিতে পারিবে কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। কেবল বিধবার দুঃখ-কাহিনী শুনিয়া গবর্নমেন্ট দয়া করিয়া বেলুনটা পরীক্ষা করিবার জন্য যুদ্ধ বিভাগের কতিপয় অধ্যক্ষকে নিযুক্ত করিলেন। নির্দিষ্ট দিবসে বেলুন দেখিবার জন্য বহু লোক আসিল। পরীক্ষকেরা আসিয়া দেখিলেন, বেলুনটি অতি প্রকাণ্ড এবং ধাতু নির্মিত বলিয়া রেশমের বেলুন অপেক্ষা অনেক ভারী। তারপর বেলুন চালাইবার জন্য এঞ্জিন ও অনেক কল বেলুনে সংযুক্ত রহিয়াছে। এরূপ প্রকাণ্ড জিনিস কি কখনও আকাশে উঠিতে পারে! পরীক্ষকেরা একে অন্যের সহিত বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত কল কোনোদিনও পৃথিবী ছাড়িয়া উঠিতে পারিবে না। লোকটা মরিয়া গিয়াছে, আর তাহার বিধবা অনেক আশা করিয়া দেখাইতে আসিয়াছে; সুতরাং অন্ততঃ নামমাত্র পরীক্ষা করিতে হইবে। তবে বেলুনের সহিত অতগুলি কল ও জঞ্জাল রহিয়াছে, ওগুলি কাটিয়া বেলুনটিকে একটু পাতলা করিলে হয়তো ২/৪ হাত উঠিতে পারিবে। হায়!

তাহাদিগকে বুঝাইবার কেহ ছিল না; বেলুন যিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার স্বর আর শুনা যাইবে না! যে সব কল অনাবশ্যক বলিয়া কাটিয়া ফেলা হইল তাহা আবিষ্কার করিতে অনেক বৎসর লাগিয়াছিল। ঐ সব কল দ্বারা বেলুনটিকে ইচ্ছানুসারে দক্ষিণে, বামে, ঊর্ধ্বে ও অধোদিকে চালিত করা যাইত।